চিরায়ত বই

২০

চৈতালী-ঘূর্ণি

চৈতালী-ঘূর্ণি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈতালী-ঘূর্ণি
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

নান্দীমুখ
শেখ মোহাম্মদ সালেহ্ রাব্বী

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

Chaitali Ghurni a novel by Tarasankar Bandyopadhyay Published by
Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: August 2023
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US$ 10
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96871-6-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুরে, ১৮৯৮ সালের ২৩ জুলাই। কলেজ ছেড়ে মহাত্মা গান্ধির ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দান। কারাবরণ করেছেন একাধিকবার। আজীবন কংগ্রেসি রাজনীতিতে আস্থাশীল, ছিলেন আইন প্রণেতাও। বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। লিখেছেন ৬৫টি উপন্যাস, ৫৩টি ছোটগল্প-সংকলন, ১২টি নাটক, ৪টি প্রবন্ধ-সংকলন, ৪টি স্মৃতিকথা, ২টি ভ্রমণকাহিনি, ১টি কাব্যগ্রন্থ এবং ১টি প্রহসন।

আরোগ্য নিকেতন উপন্যাসের জন্য ১৯৫৫ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' ও ১৯৫৬ সালে 'সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার' পান। ১৯৬৭ সালে *গণদেবতা* উপন্যাসের জন্য 'জ্ঞানপীঠ পুরস্কার'। ১৯৬২ সালে 'পদ্মশ্রী', ১৯৬৮ সালে 'পদ্মভূষণ' সম্মানেও বিভূষিত হন তিনি। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'শরৎস্মৃতি পুরস্কার' (১৯৪৭) ও 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' (১৯৫৬)-এ সম্মানিত। তাঁর চল্লিশটি রচনা চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। যাদের অন্যতম *সপ্তপদী*, *দুই পুরুষ*, *গণদেবতা*, *আরোগ্য নিকেতন*, *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*, *অভিযান* ও *জলসাঘর*।

রাঢ়ের মানুষের জীবনচিত্র, ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম, মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সামন্ততন্ত্র-ধনতন্ত্রের দ্বন্দ্বে পুঁজির বিজয়– সর্বোপরি নবভারত ছিল তারাশঙ্করের সাহিত্য সাধনার মূল বিষয়বস্তু।

দাম্পত্যসঙ্গী : উমাশশী দেবী। মৃত্যু : ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে।

অনাবৃষ্টির-বর্ষার খররৌদ্রে সমস্ত আকাশ যেন মরভূমি হইয়া উঠিয়াছে; সারা নীলিমা ব্যাপিয়া একটা ধোঁয়াটে কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব; মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বাতাস, হু-হু করিয়া একটা দাহ বহিয়া যায়।

গোষ্ঠ মাঠের কাজ সারিয়া ঘরের দাওয়ায় কোদালখানি রাখিয়া কলিকায় তামাক সাজিয়া টানিতে বসিল; টানিয়াই যায়, আর কী যেন ভাবে।

পত্নী দামিনী হাতাখানা পুড়াইয়া ডালের মধ্যে সশব্দে ডুবাইতে কহিল, কী ভাবছ বলো তো?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গোষ্ঠ কহে, হুঁ, ভাবছি—ভাবছি কী জানো, তুমিও তো অনেক দিন এসেছ, বলো দেখি, গাঁ-খানা কী ছিল আর কী হলো?

দামিনী কহে, তা সত্যি বাপু, সেই গাঁ—সবারই ঘরে গোলা-ভরা ধান, যাত্রা, মচ্ছব কত; বছর বছর নটবরের যাত্রা হয়েছে; এখন আজ খেতে কারু কাল নাই।

গোষ্ঠ বলে, জানো, আজ মাঠ থেকে ফিরতে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে গা শিউরে উঠল। সমস্ত গাঁটা যেন আবছা ধোঁয়াতে ছেয়ে গিয়েছে, নদীর বুকে বাতাসে তপ্ত বালি হু-হু করছে, নদীর ওপরেই শ্মশানের ছাই উড়ছে, শেয়াল কুকুর শকুনি চ্যাঁচাচ্ছে; গাঁয়ের মাঝ থেকে একটা সাড়া নাই কারু, যেন সব মরে গিয়েছে; আমার বুকখানা কেমন করে উঠল বাপু।

দামিনী ভয়ে শিহরিয়া ওঠে; তরুণীটির সদাহাস্যময়ী মুখখানি মলিন হইয়া ওঠে, উহারও তরল মনের বুকে ভাবনার বোঝা চাপিয়া বসে।

সত্যই বিভীষিকা জাগে।

গ্রামে ঢুকিতেই প্রথমেই একটা নদী।

নদী ঠিক নয়, একটা মরুভূমি, লম্বা একটানা বালুকার প্রবাহ, জল নাই; অন্তত বৎসরের মধ্যে আটটি জলধারা বয় না, বয় একটা অদৃশ্য অগ্নিলীলা, খররৌদ্রে হু-হু করে মরীচিকার ধারা।

আর ওই মরীচিকা, ওই নৃত্যশীল অগ্নিধারা, ও তো মিথ্যা বা মায়া নয়, ও শুষ্কবক্ষ মাটির তৃষ্ণা; নিদারুণ রুক্ষতায় হা-হা করে।

নদীর পরই চরের উপর শ্মশান।

এখানে অগ্নিলীলা অদৃশ্য নয়, রাশি রাশি অঙ্গারে, চিতার লকলকে রক্তরাঙা বহ্নিশিখায় বাস্তবে মূর্ত।

জীবন্তের সঙ্গে সম্বন্ধই নাই, আছে শুধু উত্তাপ, অগ্নি, অঙ্গার, কঙ্কাল, শব।

জীবন্তের মধ্যে, আকাশের বুক হইতে তীক্ষ্ম চিৎকার শকুনির পাল শবগুলার বুকে গলিত দেহের লোভে ঝাঁপাইয়া পড়ে, বীভৎস দুর্গন্ধময় বিশাল ডানা দুইখানার ঝাপটে এ উহাকে তাড়ায়, ও ইহাকে তাড়ায়।

আর আসে শৃগারের দল, শবগুলার বুকে পা রাখিয়া রক্তহীন মাংসের পিণ্ডে দাঁত বসাইয়া কুকুরগুলা গোঙায়—গোঁ-গোঁ।

শৃগালের দল দূরে আর একটা শবের বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। তীক্ষ্ণ রোমাঞ্চকর কোলাহলে চরখানা মুখর হইয়া ওঠে। গাছের ছায়ায় পূর্ণ-উদর তন্দ্রাচ্ছন্ন কয়টা কুকুর শবগুলার পানে চাহিয়া থাকে, পূর্ণ উদর, তবু লোভের অন্ত নাই, লোলুপ লোভে মুখগুলা হাঁ করিয়া থাকে, লম্বা করকরে জিভগুলা ঝুলিয়া পড়ে, আর তাহাতে অনর্গল গড়ায় লালসার লালা।

বায়ু, যে বায়ু মানুষের জীবনে, সেও এখানে ভয়াল, সেও পাগলের মতো অবিরাম আপন অঙ্গে মাখে চিতার ছাই, গলিত শবের দগ্ধ দেহের বীভৎস দুর্গন্ধ।

শ্মশানের পরই খান তিরিশেক মাঠ, তাহার পর গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে শ্মশানটা, যেন জীবনের রাজ্যে মরণের অভিযান; পল্লিটার দ্বারপ্রান্ত অবরোধ করিয়া যেন মরণের ফটকখানা বসাইয়াছে।

মাঠের ফসল শ্মশানের প্রান্ত পর্যন্ত জাগিয়া ওঠে, কিন্তু নিচে শুষ্ক নদীর টানে মাঠের রসটুকু চোয়াইয়া ওই রাক্ষসী বালুকা-প্রবাহের বুকে মিশিয়া যায়।

কঠিন রসলেশহীন মাটির বুকে শীর্ণ পাংশুটে গাছগুলি তবু অতি কষ্টে বাঁচিয়া থাকে, যেন শুষ্কবক্ষ কঙ্কালাবশেষা নারীর সন্তান সব; মরণের শোষণে রসময়ী ধরণী মা, সেও বুঝি বন্ধ্যার মতো শুষ্কবক্ষা হইয়া উঠিল। বাতাস বয়, সঙ্গে সঙ্গে চিতার ছাই ওড়ে; এদিকে গাছগুলা দোলে, উহাদের পাতায় ছাইগুলা জড়াইয়া যায়; যেন মুমূর্ষু জীবন-মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করে, শ্মশানটাকে অগ্রগমনে বাধা দেয়।

অন্ধকারের মাঝে প্রেত নাচে; তাই অন্ধকারের মাঝে জীবন্ত মানুষকেও প্রেত বলিয়া ভ্রম হয়, আর প্রেতত্ব পায়ও মানুষ; তাই অন্ধকারের মাঝেই মানুষ চোর, মানুষ ঘাতক। বাহিরের ওই মরণের রাজ্যের ছায়ায় গ্রামখানাও ঠিক যেন মৃতের রাজ্য।

মানুষ তো নয় সব, হাড়-চামড়া ঝরঝর করে, কঙ্কালসার মানুষ অতি ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়; বাড়িঘরের অবস্থাও তাই, দেয়ালগুলার লেপন খসিয়া গিয়াছে, যেন পঞ্জরাস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে; চালও তাই, খড় বিপর্যস্ত, কাঠামো ভাঙিয়া পড়ে পড়ে। অবরুদ্ধ জীবন্তের রাজ্যের টুকরাখানা বুঝি আর থাকে না।

কে রক্ষক?

রক্ষক ভগবান কত দূরে, কে জানে!

লোকে ভগবানকেও ডাকে।

কিন্তু সে ডাক বুঝি ততদূর পৌঁছায় না।

কিংবা সে বুঝি অতি নিষ্ঠুর।

তবু উচ্চকণ্ঠে ওরা প্রতি সন্ধ্যায় তাকে ডাকে—

"ও তার নামের গুণে গহণ বনে, মৃত তরু মুঞ্জরে,
নামের তরি বাঁধা ঘাটে ডাকলে সে যে পার করে।"

ওই বিশ্বাসটুকুর আশ্বাসেই উহারা বাঁচিয়া আছে, ওইটুকুই জীর্ণ স্বর্ণসূত্রের মতো এই জীবনের মালাখানি আজও গাঁথিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ও আশ্বাসও আজ অতি ক্ষীণ, অতি দুর্বল; তাই উহারা মুখে বলে, হরি হে, যা করো। কিন্তু মন ঠিক ওই কথাটা মানিয়া লইতে চায় না, সে কবিরাজের 'ডাক্তোরখানা' পর্যন্ত ছুটায়, বটিকা পাঁচন মুখ খিঁচাইয়া গিলায়।

বাঁচিলে দেবতার পূজা দেয়; না বাঁচিলে বলে, পাথর, পাথর, দেবতা-ফেলতা মিছে কথা।

মোটকথা, ভগবানকে উহারা মানে, কি মানে না, সেটা আজ অমীমাংসিত সমস্যা।

ডাকিতেও মন চায় না, না ডাকিলেও মন খুঁতখুঁত করে।

উপলব্ধ সত্য আর যুগযুগান্তের সংস্কার এখানে প্রবল দ্বন্দ্ব; ব্যর্থতায় বুকের ভিতর ক্ষোভ জাগিয়া ওঠে—সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ঝড়ো হওয়ার মতো।

কিন্তু সে চৈত্র-প্রান্তরের ঘূর্ণির মতোই ক্ষীণ আর ক্ষণস্থায়ী, উঠিয়াই মিলাইয়া যায়।

শ্মশানখানা যেন দিন দিন আগাইয়া আসিতেছে। সুদূর আফগানিস্তানের কাবুলীর দল শকুনির মতো তীক্ষ্ণ চিৎকারে খাটো খাটো ভাঙা বাংলায় হাঁকে, ও গুষ্ঠা মুড়ার, আরে এ—

দামিনীর তখন ওই বিভীষিকাময়ী ভাবনায় দম যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, সে কহিতেছিল, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে, তোমার হলো তাই। গাঁয়ের ভাবনা ভাবতে লাগলে—

সহসা বাহির হইতে ওই কাবুলীওয়ালার ডাক।

দামিনী কহে, ওই নাও, যা বলছিলাম তাই, এখন কী করবে করো।

বাহির হইতে হাঁক আসে, এ গুষ্ঠা, আরে এ—! সঙ্গে সঙ্গে দরজায় লাঠিগাছটা ঠোকে, ঠকঠক।

গোষ্ঠের দেশের ভাবনা কোথায় উবিয়া যায়, হুঁকা টানিতে টানিতে সে আঁতকাইয়া ওঠে।

আবার লাঠি ঠোকার শব্দ ওঠে।

গোষ্ঠ অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া কোণে লুকাইয়া বসে, হুঁকা পর্যন্ত টানে না।

দামিনীও সঙ্গে সঙ্গে যায়; দামিনীর বুকখানা গুরগুর করিয়া ওঠে, বলে, কী হবে গো?

গোষ্ঠ ফিসফিস করিয়া বলে, বলো, ঘরে নাই।

দামিনী চাপা গলায় তাড়াতাড়ি বলিল, না, না, আমি পারব না। গোষ্ঠ হাতজোড় করিয়া মিনতি করে, হেই গো, তোমার পায়ে পড়ি।

দামিনী স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় লইতে তিরস্কার করে, ছি, কী বলো তার ঠিক নাই; আক্কেলের মাথা খেয়েছ একেবারে?

ওদিক হইতে আবার হাঁক আসে, আরে এ গুষ্ঠা, হারামজাদা, বদমাশ, বাহার আসো!

গোষ্ঠ আবাব কাকুতি করিয়া বলে, লক্ষ্মীটি, বলো বলো, নাইলে ব্যাটা আবার ঘরে ঢুকবে।

দামিনীর বুক গুরগুর করে, সে চাপা গলায় ঝংকার দিয়া ওঠে, তখন যে কাপড় কিনতে মানা করেছিলাম। ধারে পেলেই কি হাতি কিনতে হয়?

গোষ্ঠ বলে, সে তো তোমার জন্যই—

দামিনী জ্বলিয়া যায়, কিন্তু কিছু বলিবার আগেই দরজার মুখে নাল-মারা নাগরা আওয়াজ দিয়া ওঠে।

দামিনী তাড়াতাড়ি ঘরের দরজায় শিকল দিয়া বাহিরে আসিয়া ঘোমটা টানিয়া মৃদুকণ্ঠে বলে, ঘরে নাই গো।

ভাঙা বাংলায় তীক্ষ্ণকণ্ঠে কাবুলী কয়, আরে, তুমি কৌন আসো, তুমহি—

দামিনী ভয়ে কাঁপিয়া ওঠে, গলা দিয়া আওয়াজ বাহির হয় না, তাড়াতাড়ি শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিতে চায়, দেখে ভিতর হইতে খিল আঁটা।

ওদিকে নাগরার আওয়াজ উঠানের বুক অবধি আগাইয়া আসে।

দামিনী ভয়ে এক পাশে সরিয়া দাঁড়ায়।

কাবুলী কয়, তুমি কৌন আসো? উস্কো কৌন? বহু আসো?

দামিনী ঘাড় নাড়ে, হ্যাঁ।

কাবুলী কয়, তব তো তুমহি টাকা দিবিস; পনরা টাকা, পনরা টাকা, দশ আওর পান লিয়ে আন।

দামিনীর গলা শুকাইয়া যায়, তবু আর্তস্বরে কহে, ঘরে নাই, আসুক।

কাবুলী দাঁত বাহির করিয়া বলে, তব তুম আসো, তুমকো লিয়ে যাবে।

দামিনী ভয়ে চ্যাঁচাইয়া ওঠে।

কাবুলী হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়, আপন ভাষায় গোটা জাতকে গালি দেয়।

দামিনী কাঠ হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকে, চোখ দিয়া জল পড়ে, তবু সে চোখ আগুনের মতো জ্বলে।

কতক্ষণ পর দরজা খুলিয়া গোষ্ঠ বাহিরে উঁকি মারিয়া বলে, গিয়েছে ব্যাটা শকুনি?

দামিনী কথা কয় না, চোখের জলের প্রবাহ দ্বিগুণ হইয়া বয়, মুখখানা কঠিন হইয়া ওঠে।

গোষ্ঠ আড়চোখে দামিনীর মুখপানে তাকাইয়া কয়, একদিন এমন ঠেঙান ঠেঙাব।

এই নির্লজ্জ আস্ফালন কানে আগুনের হল্কার মতোই ঠেকে, সে মাটির উপরেই সজোরে থুৎকার নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়।

ঘরের ভিতর পাঁচ বছরের ছেলেটা জ্বরে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চ্যাঁচায়, ক্ষিঁধে লেঁগেছে—এঁ—এঁ—এঁ—।

দামিনী তীব্রকণ্ঠে বলে, মর, মর, আমার হাড় জুড়োক।—বলিয়া একথালা মুড়ি সশব্দে ছেলেটার মুখের কাছে নামাইয়া দিয়া আবার বলে, নাও, গেলো, গিলে যমের বাড়ি যাও।—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চোখ মোছে, কিন্তু সে জল মুছিয়া শেষ করিতে পারে না।

গোষ্ঠ সভয়ে কহে, মুড়ি কেন? সাবু সাবু—

দামিনী কথা কাড়িয়া বলে, সাবু আমি রোজগার করে আনব, নয়?

গোষ্ঠ চুপ করিয়া যায়, ক্ষণেক পর আপন মনেই কয়, তা পুরনো জ্বর বটে, তা খা, দুটো মুড়ি খা। কত আর সাবু খাবি?

ছেলেটা কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট হয় না, সে মুড়ি ছড়াইয়া ফেলিয়া চ্যাঁচায়, ভাঁ—আঁ—আঁ—ত খাঁ—আ—বো—ও—ও।

চিৎকারে বিরক্ত হইয়া গোষ্ঠ উঠিয়া যায়।

কোথায় যাইবে? নিরানন্দ এ পুরীতে কোথায় আনন্দ? গোষ্ঠ মাঠের পথ ধরে, ওই হোথায় গিয়া আশার আলো নজরে ঠেকে, শেষ আষাঢ়ের সবুজ মাঠ, কচি কচি লকলকে ঘন সবুজ ফসলের ডগাগুলি হেলে দোলে আর যেন কত কথা বলে, ধানের ডগাগুলি যেন বলে—

"ধান, ধান, ধান—ধানে রাখবে জান,
ঋণ শোধিব খাজনা দিব
ধানে রাখবে আমার মান।
নতুন বস্ত্র পুরনো অন্ন
এই যেন খেতে পাই জন্ম জন্ম।"

গোষ্ঠ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ঘন সবুজ ধানের পানে তাকাইয়া থাকে। ইচ্ছা করে এইখানেই দিবারাত্রি কাটাইয়া দেয়।

ওদিক হইতে আখের পাতাগুলি ইশারা করিয়া দুলিয়া দুলিয়া যেন ডাকে, গোষ্ঠ আগাইয়া চলে, আর আপন মনেই গুনগুন করিয়া বলে—

"কাজুলি রে কাজুলি,
তোর পায়ে এবার আমার
বউ পরাবে মাদুলি।"

তকতকে নিড়ানো খেতে বসিয়া গোষ্ঠ বিনা কাজে হাতে করিয়া ভুরার মতো গুঁড়া মাটি পেষে, সারা অঙ্গে মাখিতে ইচ্ছা করে।

মাঠের আলপথে ভিন গাঁ হইতে দোকান সারিয়া ফিরিতেছিল ভোলা ময়রা। সে কহিল, কি গোষ্ঠ, রোদে কী হচ্ছে?

সত্য কথা বলিতে কেমন লজ্জা করে, আমতা আমতা করিয়া বলে, এই খুড়ো, বসে আছি।

ভোলা খুড়ো কহে, সে আমলের খেপা মোড়লের মতো ধান বাড়াচ্ছিস নাকি? খেপা মোড়ল কী করত জানিস? দিনে, দুপুরে, সন্ধেয় বাড়ির কাজে খোলসা পেলেই মাঠে এসে নিজের ধানের ডগায় হাত দিয়ে বলত, কন—কন—কন—ওঠ—ওঠ—কন—কন করে বেড়ে ওঠ। আর পরের ধানের মাথায় হাত দিয়ে নিচে দিয়ে নামিয়ে বলত, কন—কন—কন, বসে যা, নেমে যা।

গোষ্ঠ গল্প শুনিতে শুনিতে ভোলা খুড়োর সঙ্গ ধরিয়াছিল। গোষ্ঠ কহিল, খুড়ো, খেপা মোড়লের অবস্থা বুঝি ভালো ছিল না?

খুড়ো চ্যাঙারিসুদ্ধ মাথা ঘুরাইয়া গোষ্ঠার পানে তাকায়; তারপর বলে, হ্যাঁ, অবস্থা তার ভালো ছিল না, তবে আজকালকার সবার চেয়ে ভালো ছিল।

গোষ্ঠ কহে, আচ্ছা খুড়ো, সেসব ধান ধন গেল কোথায় বলো দেখি?

ঠিক পাশের আখের খেতটার ভিতরে শব্দ ওঠে মড়মড় খসখস; গোষ্ঠ কহে, কে, আখ ভাঙছে কে রে, কে? কচি আখ ভাঙে কে?

ভিতর হইতে সে লোকটা হুংকার ছাড়িয়া উঠে, তোর বাপ রে, হারামজাদা।

গোষ্ঠ কিল খাইয়া কিল চুরি করে, গালিটা নির্বিবাদে হজম করিয়া চলে, গতিটা একটু বাড়াইয়া দেয়, আপন মনেই বলে, বাঘে ধান খায় তো তাড়ায় কে? ভাঙ বাবা, জমিসুদ্ধ তুলে নিয়ে যাও।

যে লোকটা আখ ভাঙিতেছিল, সে জমিদারের চাপরাসী। খুড়া খানিকটা আগাইয়া আসিয়া কহে, দেখলি গোষ্ঠ, ধন ধান গেল কোথা? ওই দশজনে লুটেই খেলে।

গোষ্ঠ ও কথাটার উত্তর দেয় না, আপন মনেই বলে, দেবতা-ফেবতা মিছে কথা—মিছে কথা খুড়ো, ওসব আঁকা চোখে ফাঁকা চাউনি, দেখতে পায় না।

মোড় ফিরিবার মুখে খুড়া কহে, চ্যাঙারিটা একবার নামিয়ে ধর তো গোষ্ঠ।

গোষ্ঠ চ্যাঙারিটা নামাইয়া ধরিলে একমুঠো বাতাসা লইয়া খুড়ো গোষ্ঠর আঁচলে দিয়া বলে, ছেলেটাকে দিস। ক্ষণিকের এই ক্ষীণ সহানুভূতিতে গোষ্ঠর প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

* * *

ওদিকে ছেলেটা ভাত খাইবার বায়নায় কাঁদিতে কাঁদিতে নেতাইয়া পড়ে। দামিনী দাওয়ার উপর কাঠের মতো বসিয়া ছিল, সহসা সে ছেলেকে কোলে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরে।

চোখের প্রবাহ প্রবল হয়; মনে মনে শতবার ষষ্ঠীকে স্মরণ করিয়া ছেলের মাথায় সে হাত বুলায়।

ছেলেটা তবু কাঁদে—ভাঁ—আ—ত—খাঁ—বো—ও।

স্নেহসর্বস্বা অশিক্ষিতা নারীর মন বলে, আহা, দুটি খাক। পুরনো জ্বরে তো লোকে খায়। ভাত খাইয়া ছেলেটার ক্ষুধার কান্না থামে, কিন্তু যাতনার কান্না বাড়ে, বমি হয়, জ্বর বাড়ে।

মায়ের মন সেই গাল দেয়ার কথাটাই স্মরণ করে; ভাতের কথাও মনে হয়, কিন্তু সে যে এত কয়টি, দুইটি গ্রাস।

গালটাই মনে প্রবল হইয়া জাগে, দেবতার উদ্দেশে মাথা ঠুকিয়া কপালটা ফুলিয়া ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজকেও স্মরণ হয়।

কবিরাজ ডাকিবার জন্য দামিনী ক্রমে ব্যাকুল হইয়া ওঠে।

কিন্তু সে যে নারী! ডাকিবে যে, সে কোথায় কোন আড্ডায় একটু তামাকের আশায় স্ত্রী-পুত্র সব ভুলিয়া বসিয়া আছে।

ব্যাকুল মন সঙ্গে সঙ্গে বিষাইয়া ওঠে, সে বিষের ঘোরে ভালো মন্দ জ্ঞান যেন সব লোপ পায়।

তাই যাহাকে সে দূরে রাখিতে চায়, যাহার পরম দাস্যভাব সে ঘৃণা করে, সেই সুবল দাসের কাছে ছুটিয়া গিয়া হাতে পঁইছা জোড়াটি খুলিয়া দিয়া কাকুতি করিয়া কহিল, আমাকে দুটি টাকা দাও, আর কবরেজকে একবার ডেকে দাও।

তরুণ সুবল মুগ্ধ দৃষ্টিতে দামিনীর মুখপানে তাকাইয়া আবার সলাজে মুখ নামাইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে কহিল, পঁইছে তুমি রাখো, টাকা আমি দিচ্ছি।

বিষের ঘোরের মাঝেও যাতনার দাহে চেতনা ফিরিয়া আসে, সুবলের সহানুভূতি দামিনীর বুকে সেই দাহের কাজ করিল, দামিনী ঝাঁঝাইয়া উঠিল, শুধু তোমার টাকা নোব কেন আমি?

সুবল বিবর্ণ হইয়া অনুনয় করিয়া কহিল, সধবা মানুষ তুমি, খালি হাতে—। সুবলের জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গেল।

জীর্ণ কাপড়ের পাড়খানি ঝাঁঝের মুখে এক হাত ছিঁড়িতে, তিন হাত ছিঁড়িয়া হাতে জড়াইয়া কহিল, এই আমার সোনার কাঁকন, তোমার পায়ে পড়ি মহান্ত; এ দুটো নিয়ে আমাকে টাকা দাও, ছেলেটি বুঝি আর বাঁচে না। দীপ্ত কণ্ঠস্বর স্নেহের দুর্বলতায় ভাঙিয়া পড়িল, চোখের কোলে কোলে জল টলটল করিয়া উঠিল।

সুবল ব্যস্ত হইয়া পঁইছা জোড়াটি ঘরে তুলিয়া টাকা আনিয়া দামিনীর হাতে আলগোছে দিতে গেল, কিন্তু কেমন হাত কাঁপিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট টাকা দুইটি মাটিতে পড়িয়া গেল। সুবল লজ্জায় একরূপ ছুটিয়াই পলাইল, কহিল, কবরেজকে ডেকে আনি আমি।

ঘর-দ্বার সব খোলা পড়িয়া রহিল।

দামিনী শেষে দরজায় শিকলটা তুলিয়া দিয়া বাড়ি ফিরিল।

মনটা কিন্তু কেমন ছি-ছি করিতেছিল।

একের লজ্জা অপরকেও লজ্জিত করে যে সংক্রামক ব্যাধির মতো; যাহাকে দেখে, তাহার লজ্জায় যে দেখে সেও লজ্জা পায়, হউক না কেন দ্রষ্টার মন ফুলের মতো পবিত্র।

দামিনী ওই কথাই ভাবিতে ভাবিতে ফিরিতেছিল। বাড়ির দুয়ারে তাহার চমক ভাঙিল একটা কাঁসার মতো তীক্ষ্ণ উচ্চ কর্কশ কণ্ঠ শুনিয়া।

লোকটা উচ্চকণ্ঠে কহিতেছিল, ও চালাকি চলবে না হে বাপু, সুদের টাকা আমাকে মাস মাস মিটিয়ে দেওয়ার কথা, দাও, দিতে হবে।

লোকটা মহাজন।

দামিনীর সর্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল।

দামিনী ভালো ঘরের মেয়ে, পড়িয়াছিলও ভালো ঘরে।

গোষ্ঠর অবস্থা চিরদিনই এমন ছিল না, তাহার বাপের আমল পর্যন্তও গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গাই, পুকুর-ভরা মাছ—পল্লির ঐশ্বর্য যা কিছু সবই ছিল।

কিন্তু সে শ্রী আর নাই, সব গিয়াছে।

থাকে কী করিয়া? মূল মরিলে কি ফুল বাঁচে!

পল্লির শ্রী যে গিয়াছে।

এখন অভাবের মাঝে শুধু অতীতের প্রাচুর্যের স্মৃতিই সম্বল; ছেলেকে পর্যন্ত ওই স্মৃতিকথার মামলায় সান্ত্বনা দেয়—

"আয় চাঁদ আয় আয়, গাই বিয়োলে দুধ দোব,
ভাত খেতে থালা দোব, রুইমাছের মুড়া দোব,
আম-কাঁঠালের বাগান দোব, চাঁদের কপালে
একটি চিত দিয়ে যা।"

* * *

দামিনী এ বাড়িতে আসিয়াছিল আট বছরেরটি; আজ বয়স তাহার বাইশ। ইহারই মধ্যে এই সংসার কতরূপেই না তাহার চোখের উপর ফুটিল! প্রথম প্রথম এ গৃহ কারা মনে হইয়াছে, মায়ের জন্য কাঁদিয়া দিন গিয়াছে; তাহার এ সংসার কৈশোরের প্রারম্ভে যেন পুষ্পিত উদ্যান, স্বামী কত ভালোবাসিয়াছে, কত গোপন উপহার, মনসার মেলায় গভীর রাত্রে ঘুমন্ত দামিনীর মুখে গরম বেগুনি গুঁজিয়া দেওয়া।